ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 254-261
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.030

বাউল মতাদর্শ: উৎস, বিকাশ ও সাধক-শিল্পীদের অবদান

নিরঞ্জন মণ্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত*

Received: 12.11.2024; Accepted: 29.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Baul philosophy is a unique strand of Bengali culture, shaped through spiritual thought, social context, and music. Its origins lie in a blend of folk religious beliefs and the influences of Tantra, Sufism, and Vaishnavism. The Bauls prioritize the exploration of life's fundamental rhythm, emphasizing the doctrines of body and human nature. The development of Baul philosophy was notably influenced during the 18th and 19th centuries. Figures such as the mystic Lalon Shah, Harinath Majumdar, and Bhaba Pagla popularized Baul thought through music and poetry. They stood against social divisions, religious dogma, and superstition, advocating humanistic ideals. Through their practice and music, Baul practitioners and artists led people into a deeper understanding of body metaphysics. Their songs reflect the simplicity of life, insight into the human mind, and the connection with the divine. The philosophical nature of Baul music serves not only as entertainment but also as a medium for spiritual liberation. Today, Baul philosophy is an integral part of Bengali identity. This tradition holds a special place in the rural life of Bengal and within the broader global Bengali culture.

Keywords: Baul, Humanism, Vedas, Upanishads, philosophy.

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতানুসারে, বাউল শব্দটি এসছে সংস্কৃত শব্দ বাতুল শব্দ থেকে। বাতুল শব্দটিই প্রাকৃতে বাউল রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। আবার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাউল শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, বায়ু শব্দের সঙ্গে 'ল' (আছে অর্থদ্যোতক) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বাউল শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। যোগশাস্ত্র অনুসারে, বায়ুকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্নায়বিক শক্তি বর্ধিত করা যায়। তাই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা বায়ু নিয়ন্ত্রণের এই সাধনা যারা করেন, তারাই বাউল। আর একজন গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আরবি শব্দ আউলিয়া থেকে আউল এবং আউল থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি। প্রসঙ্গত, সুফী সাধকদের একটি সম্প্রদায় আউলিয়া নামে পরিচিত। এই মত মেনে নিলে, বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুফী সাধকদের একটি যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়। আহম্মদ শরীফ ও মুহম্মদ আব্দুল হাই তাঁদের গবেষণায় 'ব্যাকুল' থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি – এই মতকেই স্বীকৃতি দান করেছেন। তাঁরা তাঁদের মতের সপক্ষে এই যুক্তি দিয়েছেন যে, বাউল সম্প্রদায় সমাজে চিরকালই ব্রাত্য বা অবহেলিত। তাই, উপহাস ছলে তাদের ব্যাকুল(ভাবোন্মাদ) বা বাতুল(অপদার্থ) বলা হয়েছে। অধ্যাপক এস এম লুৎফর রহমানের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অবহট্ট রচনা ও চর্যাগীতিতে উল্লিখিত বাজিল, বাজুল, বাজ্জিল – এই শব্দগুলি বাউল শব্দেরই পূর্বরূপ। তাঁর মতে, বজ্রী শব্দটি থেকে অভিযোজিত হয়ে বাউল শব্দটির উৎপত্তি এইভাবে, বজ্রী > বজ্জির > বাজিল/ বজ্জিল > বাজিল > বাজুল > বাউল। অধ্যাপক আহম্মদ শরীফ

এই মতকে স্বীকৃতি দান করেছেন ও তিনি এই মতানুসারে, বজ্রযানী বৌদ্ধ সাধকদের সঙ্গে বাউলের একটি যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করেছেন। আহম্মদ শরীফ বিষয়টিকে আর একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, বজ্রযান সম্প্রদায়কেই যদি ব্রজকুল বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে এই ব্রজকুল সম্প্রদায় থেকেই বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হতে পারে।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মত গ্রহণ করলে বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে। বেশিরভাগ গবেষকগণ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু, কোন ধর্মসম্প্রদায়ই রাতারাতি সৃষ্টি হতে পারে না, বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভবেরও দীর্ঘ ইতিহাস আছে। আমরা আমাদের আলোচনার মাধ্যমে বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টির শিকড়ে পৌঁছাবার চেষ্টা করবো। ভারতবর্ষীয় তথা বাংলার বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে বাউল সম্প্রদায় কীভাবে উদ্ভূত হল, সেই দীর্ঘ পথকেই আমরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো। বাউলদের মতে –

> "আমাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল সহজ-নিত্য মানব-সত্যের উপরে। কাজেই যতকাল মানব, ততকাল এই সহজ বাউলিয়া মত। বেদ পথ তো সেদিনের। তাহা তো কৃত্রিম। ঋষিরা সেইদিন তাহা রচনা করিয়াছেন। বাউলিয়া মতই অনাদি কালের। বেদের আদি আছে।"[১]

মানব সভ্যতার সৃষ্টি থেকে প্রাকৃতিক নিয়মেই মানব ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। তাই বাউলরা মনে করে বেদের মধ্যেও মানব ধর্মের সংমিশ্রণ হয়েছে আর বাউলরা যেহেতু সেই আদি মানব ধর্মের অনুসারী তাই তারা বেদ মানে না বরং তারা বেদের মধ্যে উল্লেখিত মানব ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুসরণ করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়—

> "বাহিরের বেদকে বিদায় দিলেই অন্তরের বেদ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই 'অন্তরবেদ' মানিলে শাস্ত্রের প্রয়োজন আর থাকে না। পূজা-রোজা-নিয়ম-নেমাজ সবই ঘুচিয়া যায়। জাতি-বর্ণ প্রভৃতির ভেদ বুদ্ধিরও অবসান হয়। ইহারই নাম কায়াগত সহজ বেদ। এই বেদই বিশ্বের আকাশে নানারূপে নিরন্তর মূর্তিমন্ত ও ধ্বনিত।"[২]

বাউল সাধনায় বেশ কিছু প্রাচীন ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন – প্রজ্ঞা উপায়, শিবশক্তি ও মানব ধর্ম। এইবার আমরা যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবো তা হল 'মানব ধর্ম'। বাউলদের সাধনার মূলমন্ত্র হল 'মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সন্ধান'। এই চিন্তাধারা বাউলদের প্রভাবিত করেছে যা ভারতীয় দর্শন ও তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছে। বাউলদের মানবধর্মের ধারণাটি আদি ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তাধারা ও দর্শন থেকে এসেছে। বৈদিক যুগ থেকেই মানুষের মধ্যে দেবত্বের অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন দর্শন উদ্ভূত হয়েছে। উপনিষদে বিশেষভাবে আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যের ধারণাটি আলোচিত হয়েছে, যা বাউল সাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সিন্ধু সভ্যতা, যা আজ থেকে প্রায় ৫৫০০ বছর আগে গড়ে উঠেছিল, তখনকার মানুষ বিভিন্ন ধর্মীয় চেতনা ধারণ করতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এই চেতনা মূলত প্রকৃতি ও প্রাণী কেন্দ্রীক ছিল, যেমন পশু, গাছ, পাখি এবং জলের প্রতি শ্রদ্ধা। সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে এমন কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়, যা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা এবং মানবিক সংহতির ওপর ভিত্তি করে ছিল। যদিও তারা নির্দিষ্ট দেবদেবীর পূজায় বিশ্বাসী ছিল, তবুও তাদের চেতনা মূলত মানবিক মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। বাউলদের মানব ধর্মের সাধনা অনেকটাই প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল, যা সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় ভাবনার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তাদের মধ্যে মূল বিশ্বাস হলো মানব হৃদয়ে ঈশ্বরের অবস্থান এবং প্রকৃতির মাধ্যমে সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। এই দর্শন সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের প্রকৃতির প্রতি বিশ্বাসের সাথে মিল রেখে চলে, যা প্রাক-আর্য ধর্মীয় ভাবনার প্রভাব প্রকাশ করে। তবে, সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় জীবন সরাসরি বাউলদের মত মানব ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি; বরং

বলা যায়, সেই যুগের প্রাকৃতিক চেতনা ও মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আজকের বাউলদের মানব ধর্মের ধারণা গড়ে উঠেছে। সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় দর্শন ও বাউলদের মানব ধর্মের সাধনা সরাসরি এক নয়; তবু বলা যায়, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রকৃতির সম্মিলনে সৃষ্ট মানবিক ধর্মীয় চেতনা, যা আমরা বাউলদের মধ্যে দেখি, তার শিকড় সিন্ধু সভ্যতার প্রাকৃতিক বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত রয়েছে। সহজিয়া দর্শন, যা বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান এবং তান্ত্রিক প্রথার সাথে সম্পর্কিত, বাউলদের মানবধর্মের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। সহজিয়া তত্ত্বের মূলমন্ত্র ছিল দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জন করা। সহজিয়া দর্শন মানুষকে ব্রহ্ম বা পরম সত্যের প্রকাশ হিসেবে দেখে, এবং এই ধারণাটি বাউল সাধনায় মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। সুফি এবং ভক্তি আন্দোলনও বাউলদের মানব ধর্মের সাধনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। সুফি সাধনার মূলে আছে প্রেম ও সমর্পণ, যা বাউল দর্শনের সাথে মিলে যায়। এছাড়া, ভক্তি আন্দোলনও একইভাবে ভগবানকে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করার শিক্ষা দেয়, যা বাউলদের আধ্যাত্মিক পথে অনুপ্রাণিত করে। চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবধারা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ বাউলদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। চৈতন্য দর্শন মতে, ঈশ্বরকে মানুষের মধ্যে খুঁজে পেতে হবে, যা বাউলদের জন্য মানবধর্মের প্রতি অগ্রসর হওয়ার একটি প্রভাবশালী দিক হয়ে উঠেছে। বাউলদের মানব ধর্মের সাধনার মূল ভিত্তি হলো মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের বসবাস এবং সকলের মধ্যে পরমাত্মার উপলব্ধি। বাউলরা বিশ্বাস করে, মানুষকে ভালবেসেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়। এই মানবধর্মের ভাবনা বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দর্শনের সাথে মিলে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র বাউল তত্ত্ব গঠন করেছে, যা মানবতার প্রতি গভীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

এবার আমরা বেদ ও উপনিষদের বিভিন্ন শ্লোকে বাউল সাধনার যে দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো—

ক। ঋকবেদ-এর শ্লোকের বিশ্লেষণ—

আ যদ রুহাব বরুনশ্চ নাবম।
প্র যৎ সমুদ্রম ঈরয়াব মধ্যম।।[৩]

ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি তে বাউল সাধনার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যা আত্মোপলব্ধি ও প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের দিকে ইঙ্গিত করে। শ্লোকটি বোঝায় যে, বরুণ দেবের কৃপায় সমুদ্রের মধ্যস্থলে পৌঁছনো সম্ভব, যা বাউল সাধনার অন্তর্নিহিত ধারণার সাথেও মিলে যায়। বাউল সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য হল আত্ম-অন্বেষণ, যা বাইরের রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার থেকে ভিন্ন। বাউলরা বিশ্বাস করেন, সৃষ্টির গভীরে আত্মা বা পরমতত্ত্বকে অনুভব করতে হলে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং অন্তর্দৃষ্টি ও আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে সেই তত্ত্বের সন্ধান করতে হবে। বাউল দর্শনে 'মানুষের হৃদয়' বা অন্তর্দৃষ্টি হলো এক গভীর সমুদ্রের মতো, যেখানে সব জ্ঞানের মূল নিহিত। শ্লোকটির অর্থ এইরকমভাবে অনুধাবন করা যায়- 'বরুণ দেব, যিনি আকাশে বিরাজ করেন, তাঁর কৃপায় আমরা মহাসমুদ্রের মধ্যস্থলে পৌঁছাতে চাই'। এখানে 'মধ্যম সমুদ্র' একটি রূপক, যা সকল সৃষ্টির মূল নির্যাস এবং প্রকৃত সত্যকে নির্দেশ করে। বাউল সাধনায়ও এই অন্বেষণের রূপ দেখা যায়, যেখানে তারা জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থকে অনুধাবন করতে চায় এবং এই দেহকেই তীর্থ মনে করে আত্মার সন্ধান করে। বাউলদের মতে, দেহের মধ্যে সেই 'মহাসমুদ্র' রয়েছে, যেখানে একনিষ্ঠ ভাবে চর্চা ও সাধনা করে আত্মোপলব্ধি করা সম্ভব। তাই, বাউল সাধনা এবং ঋগ্বেদের এই শ্লোকের মধ্যে মূল ভাবটি অভিন্ন, উভয়েই সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতা, প্রকৃতির সঙ্গে মিলন এবং আত্মার সন্ধানের উপর গুরুত্বারোপ করে।

উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা।

বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।।[৪]

ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি বাউল সাধনার কিছু মূল ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ উভয়েই অদ্বৈত, প্রেম, এবং গভীর আধ্যাত্মিকতার সন্ধান করে। এখানে, বিষ্ণুর পদ বা 'উচ্চতম পদে' পৌঁছানোকে মধুর উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পথের প্রতি অন্তর্নিহিত ভালোবাসা এবং মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করে। এই ধ্যানের পথ বাউল সাধনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কারণ বাউলরা বিশ্বাস করে প্রেমের পথে তাদের অন্তরের ভগবান বা আত্মাকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে আসল সত্য লুকিয়ে থাকে। এই শ্লোকের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য যা বাউল সাধনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ১। উচ্চ আদর্শ ও প্রকৃতির সাথে ঐক্য— শ্লোকে বিষ্ণুর পদকে 'মধুর উৎস' বলা হয়েছে, যা প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সাথে মিলনের এক রূপক হিসেবে ধরা যায়। বাউলরা প্রকৃতির এবং সমস্ত জীবের সাথে মিলনের মধ্যে আধ্যাত্মিক মুক্তি খোঁজেন। ২। প্রেম ও আনুগত্য— শ্লোকের মধুরতা এবং ভক্তির ওপর ভিত্তি করে বিষ্ণুর প্রতি প্রেম এবং আনুগত্য প্রকাশিত হয়। বাউল সাধনাতেও ভক্তি ও প্রেমের চর্চা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যা তাদের জাগতিক সম্পর্ক এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আলোকিত হয়। ৩। মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা— এই শ্লোকে বিষ্ণুর পদে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা মোক্ষের প্রতীক। বাউলরা মনে করেন, মানবদেহেই ঈশ্বরের সন্ধান লুকিয়ে রয়েছে, এবং তাঁরা বিভিন্ন সাধনা ও গান গাওয়ার মাধ্যমে এই মোক্ষ অর্জন করতে চান। সুতরাং, ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি বাউল সাধনার মূল ভাবনাগুলির একটি প্রতিফলন, যেখানে আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং মোক্ষের প্রতি আকর্ষণ এবং আত্মার মিলনের ধারণা একইভাবে প্রকাশ পায়।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি
অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।।[৫]

ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি (ঋগ্বেদ ১০.১২৫.৩) দেবী উষা বা অম্বার থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়, যেখানে 'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈ' উক্তির মাধ্যমে সৃষ্টির সার্বজনীন শক্তি বা মহাশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে। এখানে বাউল সাধনার কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়, যা মূলত যোগ, ঈশ্বরের সাথে একাত্মতা ও বিশ্বচেতনার ধারণার সাথে সম্পর্কিত। আমি রুদ্রদের (শক্তিশালী দেবতা) সাথে ঘুরে বেড়াই এবং আমি বসুদের সাথে চলি, আমি আদিত্যদের সাথে এবং সকল দেবতার সাথেও আছি''। এখানে 'আমি' বলতে সার্বজনীন শক্তি বোঝানো হয়েছে, যা দেব-দেবীদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় এবং বিশ্বে বিরাজমান। ১. সর্বজনীনতার ধারণা: বাউল সাধনা সৃষ্টিকর্তার মধ্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান করে এবং জীব-জগতের সাথে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করে। ঋগ্বেদের এই শ্লোকও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সকল জীবের একাত্মতার বার্তা দেয়। ২. সাধনার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি: বাউলগণ নিজের মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে অনুভব করার চেষ্টা করে, যা এই শ্লোকের ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করে। 'অহম' শব্দটি এখানে আত্মোপলব্ধির কথা বলে, যা বাউলদের অনুশীলনেও গুরুত্বপূর্ণ। ৩. বিশ্বচেতনার সাথে সংযোগ: শ্লোকটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, দেবতা ও প্রাণীর মধ্য দিয়ে এই শক্তি সর্বত্র বিরাজমান, যা বাউল চিন্তাধারায় অত্যন্ত গুরুত্ব পায়। এইভাবে, ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি বাউল সাধনার সার্বজনীনতা, আত্মোপলব্ধি এবং বিশ্বচেতনার বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত।

খ। যজুর্বেদ-এর শ্লোকের বিশ্লেষণ—

কেশ্বন্তঃ পুরুষ আবিবেশ
কান্যন্তঃ পুরুষে আর্পিতানি।[৬]

উপরোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটি যজুর্বেদ থেকে গৃহীত এবং এটি 'বাউল সাধনা' বা বাউল দর্শনের সাথে যুক্ত করার মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ধারণ করে। এই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করলে বাউল দর্শনের সাথে এর সম্পর্ক উন্মোচিত হয়। ১। 'কেশ্বন্তঃ পুরুষ আবিবেশ' – অর্থাৎ 'পুরুষ বা জীব (আত্মা) সর্বত্র বিরাজমান', জীব আত্মা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বাউল দর্শনেও একইভাবে জীবকে সর্বত্র বিরাজমান এবং পরম সত্তার অংশ হিসেবে দেখা হয়। বাউল সাধকগণ বিশ্বাস করেন যে সৃষ্টিকর্তা ও আত্মা এক, এবং সেই সত্যটি খুঁজতে তাদের আধ্যাত্মিক পথে সাধনা করতে হয়। ২। 'কান্যন্তঃ পুরুষে আর্পিতানি' – এখানে বোঝানো হয়েছে যে সকল কিছু পুরুষ বা সেই আধ্যাত্মিক চেতনার অংশ হিসেবে নিহিত। বাউল দর্শনে, আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধানই মূল উদ্দেশ্য এবং সব কিছুই এক সর্বোচ্চ চেতনার মধ্যে আবদ্ধ। ৩।সর্বত্র বিরাজমান চেতনা: বাউল সাধনা মূলত একচেতনবাদী ধারণায় বিশ্বাসী, যেখানে তারা মনে করে যে সৃষ্টিকর্তা বা চেতনা সর্বত্র বর্তমান। উপরের শ্লোকেও পুরুষকে সর্বত্র বিরাজমান বলা হয়েছে, যা এই ধারণাকে প্রতিফলিত করে। ৪। আধ্যাত্মিক প্রেম: বাউল দর্শন আধ্যাত্মিক প্রেমকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং তারা মনে করে এই প্রেমের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে চেনার চেষ্টা করে। এই শ্লোকেও সেই প্রেম ও সংযোগের ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। ৫। অন্তর্মুখী সাধনা: বাউল দর্শনে বাইরের থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় অন্তরের অনুসন্ধানকে, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, আসল সত্য আত্মার মধ্যেই নিহিত। শ্লোকটি বাউল সাধনার এই ধারণাকেই সমর্থন করে যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য আত্মার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই শ্লোকটি বাউল সাধনার মূল ধারণাগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেখানে আত্মার গভীরে যেতে হবে এবং সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে।

গ। উপনিষদ-এর শ্লোকের বিশ্লেষণ—

দ্বা সযুজা সখায়া।[৭]

বাউল সাধনা এক বিশেষ আধ্যাত্মিক পথ, যা আত্মার মুক্তি এবং মানুষের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনে নিবেদিত। এই সাধনার মূল ভাবধারার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে মানব প্রেম, একত্বের বোধ, এবং দ্বৈততা থেকে মুক্তি। বাউলগণ প্রথাগত ধর্মীয় আচরণের বাইরে গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যকে খোঁজে। 'দ্বা সযুজা সখায়া' এই সংস্কৃত শ্লোকটি সরাসরি উপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে, যার মানে হল দুই বন্ধু, বা সহযাত্রী যারা একসঙ্গে আছেন। এই শ্লোকটি বাউল সাধনার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে একাধিক কারণে ১। সহযাত্রীতা ও একত্বের বোধ: বাউল সাধনায় গুরু-শিষ্য বা দুই বন্ধুর মধ্যে যে আত্মিক বন্ধন, তা একেই প্রতিফলিত করে। বাউলগণ মনে করে যে, মানুষ যদি অন্য মানুষের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে, তাহলে তার অন্তর আত্মার সাথে একাত্মবোধ লাভ করতে পারে। ২। দ্বৈততার অভাব: 'দ্বা সযুজা সখায়া' শ্লোকটি দুটি পৃথক সত্তার মিলনের প্রতীক, যা বাউলদের অদ্বৈত বোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাউল সাধনায় আত্মা ও পরমাত্মার মিলন কল্পনা করা হয় দুটি বন্ধুর মত, যারা একে অপরের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ। ৩। মানবতাবাদ ও আত্ম পথের সন্ধান: এই শ্লোকের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, আত্মার উন্নতি ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশের জন্য মানুষকে তার চারপাশের মানুষের সাথে মেলবন্ধন তৈরি করতে হবে। বাউলগণ তাদের গানের মাধ্যমে এই বন্ধুত্ব ও সাম্যের কথা প্রচার করে, যা 'দ্বা সযুজা সখায়া' শ্লোকের ভাবের সাথে মিলে যায়। 'দ্বা সযুজা সখায়া' শ্লোকটি বাউল দর্শনের সহমর্মিতা ও একাত্মতার ভাবকে প্রকাশ করে, যা আত্মার মুক্তির জন্য মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব ও একতার প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিফলিত করে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।[৮]

উক্ত শ্লোকটি কঠ উপনিষদ থেকে গৃহীত, যেখানে আত্ম-সাধনার গভীরতা এবং জ্ঞানের প্রকৃত উপলব্ধি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। শ্লোকটি বাউল সাধনার আদর্শের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ এবং তাদের জীবনদর্শনের কিছু মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। 'এই আত্মাকে কথোপকথন, তর্ক-বিতর্ক, বা প্রচুর শ্রবণ দিয়ে পাওয়া যায় না। যাকে আত্মা নিজে বেছে নেন, সেই ব্যক্তি আত্ম-প্রাপ্তিতে সফল হন। আত্মা স্বয়ং তার শারীরিক রূপকে প্রকাশ করে'। ১। প্রচলিত শিক্ষা বা যুক্তি-বিচারের বাইরে থাকা: শ্লোকটি নির্দেশ করছে যে আত্মজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অর্জন কেবলমাত্র তর্ক বা যুক্তির মাধ্যমে সম্ভব নয়, বরং এটি একটি অন্তর্গত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। বাউল সাধনায়ও একইভাবে মন ও আত্মার গভীরতা অন্বেষণের গুরুত্ব দেওয়া হয়। ২। ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি: বাউল সাধনার প্রধান আদর্শ হল ঈশ্বরকে বাহিরে নয় বরং নিজের মধ্যে অনুসন্ধান করা। ঠিক তেমনি, এই শ্লোকেও বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে সক্ষম হয়, যাকে ঈশ্বর নিজেই বেছে নেন এবং যার প্রতি তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চান। ৩। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গুরুত্ব: বাউলরা বহির্জগতে নয় বরং অন্তর্জগতে ঈশ্বরের সন্ধান করে। উপনিষদের এই শ্লোকটিও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্বারোপ করে, যা বাহ্যিক বক্তৃতা বা শিক্ষার মাধ্যমে নয় বরং আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে সম্ভব। ৪। আত্ম অনুসন্ধান: এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে প্রকৃত জ্ঞানলাভ তখনই সম্ভব, যখন আত্মা নিজেই নিজের আসল রূপটি প্রকাশ করে। বাউল সাধনায় 'দেহতত্ত্ব' বা শরীরকে 'দেবতা' বলে মানা হয়, যা এই ধারণারই প্রতিফলন। সুতরাং, এই উপনিষদীয় শ্লোকটি বাউল সাধনার অন্তর্নিহিত ধ্যানধারণার সাথে গভীরভাবে মিলে যায় এবং তাদের আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

বাউল দর্শনের মূল কথা হলো মানবতার চেতনা এবং মানুষের অন্তর্গত জগতের অনুসন্ধান। তারা বিশ্বাস করে যে, মানবদেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার আসল আবাস। বাউলরা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে মানে না, বরং তাঁদের বিশ্বাসের কেন্দ্রে রয়েছে মানবপ্রেম, সহজিয়া সাধনা, এবং দেহতত্ত্ব। (ক) বৈষ্ণব আচার— বাউলরা বৈষ্ণব ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, বিশেষত কৃষ্ণ ভক্তির প্রতি নিবেদিত। এ আচারগুলোর মধ্যে পঞ্চভূত পূজা, দেহতত্ত্বের অনুসন্ধান, এবং সাধন ভজনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। (খ) দেহতত্ত্ব ও সহজিয়া সাধনা— বাউল সাধকরা বিশ্বাস করে যে দেহের ভেতরেই সমস্ত আধ্যাত্মিক সত্য লুকানো রয়েছে। সহজিয়া সাধনার মাধ্যমে তারা দেহতত্ত্ব উপলব্ধি করে এবং সহজিয়া পথে আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জনের চেষ্টা করে। একজন বাউল সাধক হওয়ার জন্য গুরু বা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের নির্দেশনা প্রয়োজন। সাধক গুরু থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে এবং তার আদেশ মেনে সহজিয়া সাধনার পথ ধরে আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা করে। বাউল সাধনায় প্রধানত মনের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ, এবং ভজন ও সঙ্গীতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করা হয়। (গ) মনোযোগের অনুশীলন— বাউল সাধনায় মনোযোগ বা ধ্যানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ধ্যানের মাধ্যমে তারা দেহের অভ্যন্তরীণ অনুভূতির ওপর নজর রাখে এবং মনের গভীরে প্রবেশ করে। (ঘ) ভজন ও বাউল গান— বাউল সাধকরা ভজন ও বাউল গানের মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকাশ করে। গান ও সঙ্গীত তাদের সাধনার একটি প্রধান মাধ্যম, যা দিয়ে তারা মানবপ্রেম ও দেহতত্ত্বের বিষয় প্রকাশ করে। বাউল সাধনার মূল মন্ত্র হলো মানবতাবাদ। একজন বাউল সাধক মনে করে, সকল ধর্মের মূল হলো মানবপ্রেম। তাই তারা প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। তারা ভেদাভেদ মুক্ত হয়ে সমস্ত মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করে। বাউল সাধকরা সাধনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রীতিনীতি পালন করে। সাধনায় তারা নির্জনতা, ব্রহ্মচর্য, এবং উপবাস পালন করে। (ঙ) নির্জন সাধনা— একাকী নির্জন স্থানে সাধনা করা বাউলদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এতে তাদের মনোযোগ বজায় থাকে এবং আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। (চ) আধ্যাত্মিক মিলন ও মেলা— বিভিন্ন বাউল মেলা ও আধ্যাত্মিক আসরে অংশগ্রহণ করে সাধকরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি

করে এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করে। বাউল সাধকদের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, তাদের সাধনা মানবতাবাদ, সহজিয়া ভাব, এবং প্রেমতত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

বাউল সাধক এবং বাউল শিল্পীদের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে প্রথমে তাদের মূল পার্থক্য এবং ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের দিকটি বুঝতে হবে। বাউল সাধকেরা মূলত আধ্যাত্মিক সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে থাকে এবং তাদের জীবন দর্শন মূলত আত্মিক মুক্তির দিকে ধাবিত। এরা দেহতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের দর্শনকে তুলে ধরে। বাউল সাধকেরা সাধারণত লালন ফকির, ফকির আফজল শাহ, বংশীবদন শাহের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের অনুসরণ করে, যাদের জীবন ও দর্শন মরমী সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা সাধনা ও সংগীতের মাধ্যমে দেহ, আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে। তাদের গান ও সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং মানবাত্মার মহিমাকে তুলে ধরা।

অন্যদিকে, বাউল শিল্পীরা বাউল গানের ধারক ও বাহক হিসেবে বিভিন্ন মঞ্চে বাউল গান পরিবেশন করে এবং এটি পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে করে। যদিও অনেক বাউল শিল্পীর মধ্যে বাউল দর্শন অনুরণিত হয়, তারা সাধারণত আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে পুরোপুরি উৎসর্গিত নাও হতে পারে। বাউল শিল্পীরা মঞ্চ, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদিতে বাউল গান পরিবেশন করে থাকে এবং এতে তারা অর্থ উপার্জনের জন্যও গান পরিবেশন করে। ১। আধ্যাত্মিক সাধনা বনাম পেশাগত দিক— বাউল সাধকেরা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জগতে ডুবে থাকে, যা তাদের সাধনার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, বাউল শিল্পীরা বাউল গানের প্রচারে মনোযোগী হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়। ২। গান ও সাধনার উদ্দেশ্য— বাউল সাধকেরা আত্মিক মুক্তি ও ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে গান করে, যা তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের অংশ। অপরপক্ষে, বাউল শিল্পীরা গান পরিবেশন করে মূলত বিনোদনের জন্য বা লোকসংস্কৃতির ধারক হিসেবে। ৩। প্রভাব ও প্রচার মাধ্যম— বাউল সাধকদের প্রভাব সাধারণত তাঁদের শিষ্যগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যারা তাদের দর্শনকে প্রচার করে। তবে, বাউল শিল্পীরা মঞ্চ, টেলিভিশন ও বিভিন্ন আধুনিক প্রচার মাধ্যমে জনপ্রিয়তার কারণে বাউল গানকে একাধিক স্থানে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। ৪। ব্যক্তিগত জীবন ও জীবনযাপন— বাউল সাধকেরা সাধারণত সংসারবিমুখ জীবনযাপন করে এবং শিষ্যসহযোগে নির্জন সাধনায় মগ্ন থাকে। অন্যদিকে, বাউল শিল্পীদের অধিকাংশই পারিবারিক জীবন যাপন করে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বাউল গানের ওপর নির্ভরশীল। বাউল সাধক ও বাউল শিল্পী দুজনেই বাংলার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের মধ্যেকার মূল পার্থক্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাধনা বনাম পেশাগত প্রচার। তবে, দুই শ্রেণির অবদানেই বাউল গান ও দর্শন আজকে বাংলাদেশ ও ভারতের সংস্কৃতির একটি অন্যতম সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত।

তথ্যসূত্র:

১। পূজা মিত্র, *বাউল পদাবলীতে চৈতন্যপ্রভাব*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা. ২৮

২। ঐ, পৃষ্ঠা. ২৯

৩। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, *বাংলার বাউল* (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের লীলা বক্তৃতা), নবযুগ সংস্করণ, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, পৌষ ১৪১৬, পৃষ্ঠা. ১২

৪। ঐ, পৃষ্ঠা. ১৩

৫। ঐ, পৃষ্ঠা. ১৩
৬। ঐ, পৃষ্ঠা. ১৯
৭। ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৩
৮। ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬৪(বঙ্গাব্দ)।
২।অনুপম হীরা মণ্ডল, *ফকির লালন সাঁই ভাব-সাধনা*, ঢাকা: অবসর, ফেব্রুয়ারি, ২০১২।
৩। আদিত্য মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বজয়ী বাউল*, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১৬।
৪। আনসার উল হোক, *সব লোকে কয় লালন কী জাত*, কলকাতা: নান্দনিক, ২০১৪।
৫। আবদেল মাননান, *লালনদর্শন*, ঢাকা: রোদেলা, ২০২১।
৬। আবীর মুখোপাধ্যায়(সংকলক), *আরশিনগর বাউল ফকির উৎসবের পত্রিকা বিশেষ সংকলন*, শান্তিনিকেতন: বইওয়ালা বুক ক্যাফে, ২০১৯।
৭। আহমদ শরীফ, *বাউল ও সুফিসাহিত্য*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৩।
৮। আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, ঢাকা: বুকস্ ফেয়ার, জানুয়ারি, ২০২২।
৯। ওয়াকিল আহমেদ, *লালন গীতি সমগ্র*, ঢাকা: বইপত্র, ২০১৬।
১০। ওয়াকিল আহমেদ, *বাউল গানের ধারা*, ঢাকা: গতিধারা, ২০২৩।
১১। কার্তিক উদাস, *নাটোরের বাউল-ফকির*, ঢাকা: সমাচার, ২০১৮।
১২। পূজা মিত্র, *বাউল পদাবলীতে চৈতন্যপ্রভাব*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯।